

২. ২. খারিজী সম্প্রদায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী সর্বজনীন এবং সকল যুগেই এরূপ মানুষের আবির্ভাব হতে পারে। তবে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ একমত যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম বাস্তবায়ন হয়েছিল খারিজীদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।^{২০} খারিজী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডেই আমরা ইসলামের ইতিহাসে উগ্রতা ও সন্ত্রাসের প্রথম ঘটনা দেখতে পাই। ৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬ খৃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান খলীফা উসমান ইবনু আফফান (রা) কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না। তাঁরা রাজধানী মদীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নরগণ আলীর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু উসমান (রা) কর্তৃক নিযুক্ত সিরিয়ার গভর্নর মু'আবিয়া (রা) আলীর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দাবি জানান যে, আগে খলীফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। আলী (রা) দাবি জানান যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি ঘোরালো হয়ে গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। সিফফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সালিসী মজলিস গঠন করেন।

এ পর্যায়ে আলীর (রা) অনুসারীদের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলীর পক্ষ ত্যাগ করেন। এদেরকে 'খারিজী' অর্থাৎ দলত্যাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়। এরা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) ইন্তেকালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক। এরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম। সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় ও সরাদিন যিকর ও কুরআন পাঠে রত থাকার কারণে এরা 'কুররা' বা 'কুরআনপাঠকারী দল' বলে সুপরিচিত ছিলেন। এরা দাবি করেন যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহর নির্দেশ, অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। আল্লাহ বলেছেন:

^{২০} ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৯৩-৪১১।

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ.

“মুমিনগণের দু দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালঙ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী বা সীমালঙ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।”^{২১}

এখানে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সীমালঙ্ঘনকারী দলের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না তারা ফিরে আসে। মু‘আবিয়ার (রা) দল সীমালঙ্ঘনকারী, কাজেই তাদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। আত্মসমর্পনের আগেই যুদ্ধ থামানো বা এ বিষয়ে মানুষকে সালিস বানানোর অর্থই আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার ব্যতিক্রম বিধান দেওয়া। এছাড়া আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

“হুকুম শুধু আল্লাহরই।”^{২২}

কাজেই মানুষকে ফয়সালা করার দায়িত্ব প্রদান কুরআনের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন। আল্লাহ আরো বলেছেন:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারা ই কাফির।”^{২৩}

আলী ও তার অনুগামীরা যেহেতু আল্লাহর নাযিল করা বিধান মত মু‘আবিয়ার সাথে যুদ্ধ না চালিয়ে, সালিসের বিধান দিয়েছেন, সেহেতু তাঁরা কাফির। তারা দাবি করেন, আলী (রা), মু‘আবিয়া (রা) ও তাঁদের অনুসারীরা সকলেই কুরআনের আইন অমান্য করে কাফির হয়ে গিয়েছেন। কাজেই তাঁদের তাওবা করতে হবে। তাঁরা তাঁদের কর্মকে অপরাধ বলে মানতে অস্বীকার করলে তারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে।

খারিজীরা তাদের মতের পক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত

^{২১} সূরা হুজুরাত, ৯ আয়াত।

^{২২} সূরা আনআম, ৫৭ আয়াত, সূরা ইউসূফ, ৪০ ও ৬৭ আয়াত।

^{২৩} সূরা মায়িদা, ৪৪ আয়াত।

করতে থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী তাদেরকে এ মর্মে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝেছ তা সঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবি করেন। তারা সাহাবীদেরকে দালাল, আপোষকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।^{২৪}

সালিসি ব্যবস্থা আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-এর মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হওয়াতে তাদের দাবি ও প্রচারণা আরো জোরদার হয়। তারা আবেগী যুবকদেরকে বুঝাতে থাকে যে, আপোসকামিতার মধ্য দিয়ে কখনো হক্ক প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। কাজেই দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। ফলে বৎসর খানেকের মধ্যেই তাদের সংখ্যা ৩/৪ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৫/৩০ হাজারে পরিণত হয়। ৩৭ হিজরীতে মাত্র ৩/৪ হাজার মানুষ আলীর (রা) দল ত্যাগ করেন। অথচ ৩৮ হিজরীতে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে আলীর বাহিনীর বিরুদ্ধে খারিজী বাহিনীতে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল।^{২৫}

তারা মনে করে, যেহেতু আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) মুসলিম উম্মাহকে খোদাদ্রোহিতার মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন, সেহেতু তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করলেই জাতি এ পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার পাবে। এজন্য আব্দুর রাহমান ইবনু মুলজিম নামে একব্যক্তি ৪০ হিজরীর রামাদান মাসের ২১ তারিখে ফজরের সালাতের পূর্বে আলী যখন বাড়ি থেকে বের হন, তখন বিষাক্ত তরবারী দ্বারা তাঁকে আঘাত করে। আলীর (রা) শাহাদতের পরে উত্তেজিত সৈন্যেরা যখন আব্দুর রাহমানের হস্তপদ কর্তন করে তখন সে মোটেও কষ্ট প্রকাশ করে না, বরং আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তারা তার জিহ্বা কর্তন করতে চায় তখন সে অত্যন্ত আপত্তি ও বেদনা প্রকাশ করে। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমি চাই যে, আল্লাহর যিক্র করতে করতে আমি শহীদ হব।^{২৬}

^{২৪} নাসাই, আস-সুনানুল কুবরা ৫/১৬৫-১৬৬; ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৪৭-৪৮।

^{২৫} ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৮০-৪৩০; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৫৯।

^{২৬} মুবাররিদ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৮৫হি), আল-কামিল, ৩/১১২০।

এ গুপ্তঘাতককে প্রশংসা করে তাদের এক কবি ইমরান ইবনু হিত্তান (৮৪ হি) বলেন: “কত মহান ছিলেন সে নেককার মুত্তাকি মানুষটি, যিনি সে মহান আঘাতটি করেছিলেন! সে আঘাতটির দ্বারা তিনি আরশের অধিপতির সম্ভ্রষ্ট ছাড়া আর কিছুই চান নি। আমি প্রায়ই তাঁর স্মরণ করি এবং মনে করি, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী মানুষ তিনিই।”^{২৭}

আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী এদের নিষ্ঠা ও ধার্মিকতার কারণে এদের প্রতি অত্যন্ত দরদ অনুভব করতেন। তাঁরা এদেরকে উগ্রতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা তাদের ‘ব্রান্ডের’ ইসলাম বা ইসলাম সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। আলীকে প্রশ্ন করা হয়: এরা কি কাফির? তিনি বলেন, এরা তো কুফরী থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বলা হয়, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি বলেন, মুনাফিকরা তো খুব কমই আল্লাহর যিক্র করে, আর এরা তো রাতদিন আল্লাহর যিক্রে লিপ্ত। বলা হয়, তবে এরা কী? তিনি বলেন, এরা বিভ্রান্তি ও নিজ-মত পূজার ফিতনার মধ্যে নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে।^{২৮}

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। আরবী সাহিত্যে এদের কবিতা ইসলামী জযবা ও জিহাদী প্রেরণার অতুলনীয় ভাণ্ডার।^{২৯} এদের ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয়। রাতদিন নফল সালাতে দীর্ঘ সাজদায় পড়ে থাকতে থাকতে তাদের কপালে কড়া পড়ে গিয়েছিল। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে শুধু কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজই কানে আসতো।^{৩০} কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যেত।^{৩১}

পাশাপাশি এদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ছিল ভয়ঙ্কর। ৩৭ হিজরী থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এদের সন্ত্রাস, হত্যা ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ৬৪-৭০ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ও উমাইয়া বংশের শাসকগণের মধ্যে যুদ্ধে তারা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে সমর্থন করে। কারণ তাদের মতে, তিনিই সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু

^{২৭} মুবাররিদ, আল-কামিল ৩/১০৮৫।

^{২৮} ইবনুল আসীর, মুহাম্মাদ ইবনুল মুবারাক (৬০৬ হি), আন-নিহাইয়াহ ফী গারিবিল হাদীস ২/১৪৯

^{২৯} বিস্তারিত দেখুন, মুবাররিদ, আল-কামিল।

^{৩০} ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি), তালবীসু ইবলিস, পৃ. ৮৩-৮৪।

^{৩১} আল-আজুররী, মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (৩৬০ হি), আশ-শারী'আহ, পৃ. ৩৭।

তিনি যখন উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে কাফির বলতে অস্বীকার করলেন, উপরন্তু তাঁদের প্রশংসা করলেন তখন তারা তার বিরোধিতা শুরু করে।

৯৯-১০০ হিজরীর দিকে উমাইয়া খলীফা উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের ধার্মিকতা ও নিষ্ঠার কারণে তাদেরকে বুঝিয়ে ভাল পথে আনার চেষ্টা করেন। তারা তাঁর সততা, ন্যায়বিচার ও ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে তাদের দাবি ছিল, উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত বিধান প্রদান করেছেন। এছাড়া মু'আবিয়া (রা) ও পরবর্তী উমাইয়া শাসকদেরকেও কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে শাসকদের মনগড়া আইনে দেশ পরিচালনা করেন। যেমন, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজকোষের সম্পদ যথেষ্ট ব্যবহারে শাসকের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি। উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের এ দাবী না মানাতে শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর নিজের শাসনকার্য ইসলাম সম্মত বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।^{৩২}

এরা মনে করত যে, ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন হলেই মুসলিম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়। তারা এরূপ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ‘ইসলাম প্রতিষ্ঠা’ বা রাজনৈতিক পর্যায়ে ইসলামী বিধিবিধান তাদের ধারণামত “পরিপূর্ণ” বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে। এছাড়া তারা আলীকে কাফির মনে করেন না এরূপ সাধারণ অযোদ্ধা পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা করতে থাকে।^{৩৩}

উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ সাহাবী আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যকার রাজনৈতিক মতবিরোধ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবনু সিরীন (১১০ হি) বলেন, “যখন ফিতনা শুরু হলো, তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে ১০০ জন সাহাবীও এতে অংশ গ্রহণ করেন নি। বরং এতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ৩০ জনেরও কম ছিল।”^{৩৪}

এ সকল সাহাবী ও অন্যান্য সাহাবী-তাবিয়ী নৈতিকভাবে আলীর (রা) কর্ম সমর্থন করতেন। তাকে পাপী বা ইসলাম-লঙ্ঘনকারী বলতে কখনোই

^{৩২} ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৫১-৬১।

^{৩৩} আহমদ ইবনু হাম্বল (২৪১হি), আল-মুসনাদ ৫/১১০, ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৭৮-৩৯১; ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৫১-৬১।

^{৩৪} ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৫১।

রাজি হতেন না। খারিজীগণ এদেরকেও কাফির বলে হত্যা করত।

একটি নমুনা দেখুন! সাহাবী খাব্বার ইবনুল আরাত-এর পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁর স্ত্রী পরিজনদের নিয়ে পথে চলছিলেন। খারিজীগণ তাঁকে উসমান (রা) ও আলী (রা) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তিনি তাঁদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করেন এবং সন্তোষ ও হত্যার ভয়ানক পরিণতির বিষয়ে হাদীস বলেন। তখন তারা তাঁকে নদীর ধারে নিয়ে জ্বাই করে এবং তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী ও অন্যান্য নারী ও শিশুকে হত্যা করে। এসময়ে তারা একস্থানে বিশ্রাম করতে বসে। তথায় একটি খেজুর গাছ থেকে একটি খেজুর ঝরে পড়লে একজন খারিজী তা তুলে নিয়ে মুখে দেয়। তখন অন্য একজন বলে, তুমি মূল্য না দিয়ে পরের দ্রব্য ভক্ষণ করলে? লোকটি তাড়াতাড়ি খেজুরটি উগরে দেয়। আরেকজন খারিজী একটি শূকর দেখে তার দেহে নিজের তরবারী দিয়ে আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ তার বন্ধুরা প্রতিবাদ করে বলে, এতো অন্যায়, তুমি এভাবে আল্লাহর যমিনে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছ ও পরের সম্পদ নষ্ট করছ! তখন তারা শূকরের অমুসলিম মালিককে খুঁজে তাকে টাকা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়।^{৩৫}

এভাবে তারা অমুসলিমদের বিষয়ে ইসলামের উদারতা গ্রহণ করছে, সামান্য একটি খেজুরের বিষয়ে বান্দার হক্ক নষ্ট করাকে ভয় পাচ্ছে, অথচ ভিন্নমতাবলম্বী মুসলিমকে বিভিন্ন অযুহাতে কাফির বলে ইসলামের নামে তাকে হত্যা করেছে এবং নিরস্ত্র নারী ও শিশুদেরকেও হত্যা করেছে।

খারিজীগণের রিজ্রাঈক মতবাদের অন্যতম ছিল:

- (১) ইসলামের নির্দেশনা বা কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা। এক্ষেত্রে সাহাবীগণের মতামতের গুরুত্ব অস্বীকার করা।
- (২) হাদীস মানলেও সুন্নাত বা আলোচ্য ও বিতর্কিত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রায়োগিক কর্ম ও কর্মপদ্ধতির গুরুত্ব অস্বীকার করা।
- (৩) পাপের কারণে মুসলিমকে কাফির বলা।
- (৪) কাফির হত্যার ঢালাও বৈধতা দাবি করা।
- (৫) রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শরয়ী গুরুত্ব অস্বীকার করা।
- (৬) রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পাপের কারণে রাষ্ট্রকে কাফির রাষ্ট্র বলে গণ্য করা।
- (৭) এরূপ রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যকারী নাগরিকদেরকে কাফির বলা।
- (৮) এরূপ কাফির রাষ্ট্র ও নাগরিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ বলা।

^{৩৫} ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃ ৮৪-৮৫।

- (৯) জিহাদকে ফরয আইন, বড় ফরয ও দীনের রুকন বলে দাবি করা।
 (১০) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের নামে শাস্তি প্রদান।
 (১১) তাদের মতের বিরোধী সকল আলিমকে অবজ্ঞা করা।^{৩৬}

২. ৩. বাতিনী শীয়া সম্প্রদায়

ইসলামের ইতিহাসে আরেকটি সম্ভ্রাসী দল ছিল ‘বাতিনী শিয়া’ বা ‘হাশাশীন’গণ (Assassins)। শিয়া সম্প্রদায়ের অনেক উপদলের একটি ‘বাতিনী’ সম্প্রদায়। শিয়াগণ ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা ‘ইমামত’ বংশতান্ত্রিক বলে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পরে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয়বিধ নেতৃত্ব আলী (রা)-এর প্রাপ্য ছিল। এরপর তা তাঁর বংশধরদের মধ্যেই থাকবে। এ নেতৃত্ব বা ইমামতকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে অনেক দল উপদল সৃষ্টি হয়েছে। অধিকাংশ শিয়া বিশ্বাস করেন যে, আলী বংশের ৬ষ্ঠ ইমাম জা’ফার সাদিকের (১৪৮ হি) পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মুসা কাযিম (১৮৩ হি) ‘ইমামত’ লাভ করেন। একদল মনে করে যে, জা’ফার সাদিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইল (১৪৮ হি) ছিলেন প্রকৃত ইমাম। তাঁর পরে এ ইমামত তাঁর সন্তানদের মধ্যে থাকে। এদেরকে ইসমাইলিয়া বাতিনীয়া সম্প্রদায় বলা হয়।

‘বাতিনীয়া’ সম্প্রদায়ের মতামতের মূল ভিত্তি ধর্মের নির্দেশাবলীর ‘বাতিনী’ বা গোপন ব্যাখ্যা। তাঁদের মতে, ইসলামী ইলম দুপ্রকারের: যাহিরী ও বাতিনী।^{৩৭} তারা দাবি করেন, ইসলামের নির্দেশাবলীর দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত বাহ্যিক বা যাহিরী অর্থ। এ অর্থ সকলেই বুঝতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থ বাতিনী বা গোপন অর্থ। এ অর্থ শুধু আলী বংশের ইমামগণ বা তাদের খলীফা বা প্রতিনিধিগণ জানেন। আর এ গোপন অর্থই ‘হাকীকত’ বা ইসলামের প্রকৃত নির্দেশনা। এ ‘হাকীকতের’ জ্ঞানই প্রকৃত মারিফত। শুধু

^{৩৬} খারিজীগণের এ সকল বিভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি অপনোদনে সাহাবীগণের প্রচেষ্টা জানতে দেখুন: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের ইতিহাসে সম্ভ্রাস-জঙ্গিবাদ: একটি পর্যালোচনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬।

^{৩৭} আব্দুল্লাহ ইবনু হাজার আসকালানী, সুম্মতী, মুদ্রা আলী কারী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, ইলমুল বাতিন বা বাতিনী ইলমকে যাহেরী ইলম থেকে পৃথক বা গোপন কোন বিষয় হিসাবে বর্ণনা করে যে সকল হাদীস প্রচলিত সেগুলি সবই বানোয়াট ও মিথ্যা। এগুলি বাতিনী শিয়াদের বানানো জাল হাদীস। এ বিষয়ক জাল হাদীস এবং সহীহ হাদীসে এ বিষয়ক কি নির্দেশনা আছে তা জানতে আমার লেখা “হাদীসের নামে জালিয়াতি” গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি। দেখুন হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৩৪৩-৩৪৯। আরো দেখুন, সুম্মতী, যাইলুল মাউযু’আত, পৃ: ৪৪, মুদ্রা কারী, আল-মাসনূয়, পৃ: ৯৩।

সাধারণ জাহিলগণই যাহিরী বা প্রকাশ্য ইলম ও আমল নিয়ে পড়ে থাকে। আর সত্যিকার বান্দারা গোপন অর্থ বা হাকীকত বুঝে মারিফাত অর্জন করেন এবং সেমতই তাদের জীবন পরিচালনা করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হন।

এ মূলনীতির ভিত্তিতে বাতিনী সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের সুবিধামত কুরআনের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করতেন। ঈমান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে তারা সেগুলি বাতিল করেন। মদ, ব্যভিচার, ইত্যাদি পাপের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তারা সেগুলি বৈধ করে দেন। তাঁদের অনুসারীরা তাদের এ সকল ব্যাখ্যা ভক্তিভরে মেনে নিতেন।

৩য়-৪র্থ হিজরী শতাব্দীতে ইয়ামান, ইরাক, মরক্কো, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে ইসমাইলীয় বাতিনী শিয়াগণ ‘কারামিতা’, ফাতিমিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরা যেহেতু ইসলামের নির্দেশনাগুলিকে নিজেদের মতমত ব্যাখ্যা করত সেহেতু এরা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রয়োজনমত সন্ত্রাস, নির্বিচার হত্যা, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করত। তাদের অনুসারীরা বিনা যুক্তিতে তাদের আনুগত্য করত। এ সকল সন্ত্রাসীদের অন্যতম ছিল হাশাশিয়া নিয়ারিয়া বাতিনী সম্প্রদায়। হাশিশ বা ‘আফিম’ ও ‘গাজা’ জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার ছিল তাদের মৌলিক পরিচয়। এজন্য তারা ‘হাশাশীন’ নামে খ্যাত হয়। এরা পঞ্চম-ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার অপ্রতিরোধ্য ধারা সৃষ্টি করে। আরবী ‘হাশাশীন’ শব্দ থেকেই ইংরেজী assassin ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি গুপ্ত হত্যা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

হাসান ইবনু সাবাহ নামক এক ইরানী নিজেকে ইসমাইলীয়া শিয়া মতবাদের ইমাম ও মিসরের শাসক মুস্তানসির বিল্লাহ (৪৮৭ হি)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র নিয়ার-এর খলীফা ও প্রতিনিধি বলে দাবি করেন। তিনি প্রচার করেন যে, বুদ্ধি, বিবেক বা যুক্তি দিয়ে কুরআন ও ইসলামের নির্দেশ বুঝা সম্ভব নয়। কুরআনের সঠিক ও গোপন ব্যাখ্যা বুঝতে শুধু নিষ্পাপ ইমামের মতামতের উপরেই নির্ভর করতে হবে। আর সেই ইমাম লুক্কায়িত রয়েছেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হাসান নিজে কাজ করছেন। তিনি তার ভক্তদের মধ্যে একদল জানবায় ফিদায়ী তৈরি করেন। যারা তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মহনন সহ যে কোনো কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকত।

এদের মাধ্যমে তিনি উত্তর পারস্যে আলবুর্জ পর্বতের দশ হাজার কুড়ি ফুট উচ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরাজি পরিপূর্ণ উপত্যাকায় ‘আল-মাওত’ নামক এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে তথায় তার রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করেন।

সাধারণ জাহিলগণই যাহিরী বা প্রকাশ্য ইলম ও আমল নিয়ে পড়ে থাকে। আর সত্যিকার বান্দারা গোপন অর্থ বা হাকীকত বুঝে মারিফাত অর্জন করেন এবং সেমতই তাদের জীবন পরিচালনা করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হন।

এ মূলনীতির ভিত্তিতে বাতিনী সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের সুবিধামত কুরআনের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করতেন। ঈমান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে তারা সেগুলি বাতিল করেন। মদ, ব্যভিচার, ইত্যাদি পাপের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তারা সেগুলি বৈধ করে দেন। তাঁদের অনুসারীরা তাদের এ সকল ব্যাখ্যা ভক্তিভরে মেনে নিতেন।

৩য়-৪র্থ হিজরী শতাব্দীতে ইয়ামান, ইরাক, মরক্কো, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে ইসমাইলীয় বাতিনী শিয়াগণ ‘কারামিতা’, ফাতিমিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরা যেহেতু ইসলামের নির্দেশনাগুলিকে নিজেদের মতমত ব্যাখ্যা করত সেহেতু এরা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রয়োজনমত সন্ত্রাস, নির্বিচার হত্যা, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করত। তাদের অনুসারীরা বিনা যুক্তিতে তাদের আনুগত্য করত। এ সকল সন্ত্রাসীদের অন্যতম ছিল হাশাশিয়া নিয়ারিয়া বাতিনী সম্প্রদায়। হাশিশ বা ‘আফিম’ ও ‘গাজা’ জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার ছিল তাদের মৌলিক পরিচয়। এজন্য তারা ‘হাশাশীন’ নামে খ্যাত হয়। এরা পঞ্চম-ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার অপ্রতিরোধ্য ধারা সৃষ্টি করে। আরবী ‘হাশাশীন’ শব্দ থেকেই ইংরেজী assassin ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলি গুপ্ত হত্যা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

হাসান ইবনু সাবাহ নামক এক ইরানী নিজেকে ইসমাইলীয়া শিয়া মতবাদের ইমাম ও মিসরের শাসক মুসতানসির বিল্লাহ (৪৮৭ হি)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র নিয়ার-এর খলীফা ও প্রতিনিধি বলে দাবি করেন। তিনি প্রচার করেন যে, বুদ্ধি, বিবেক বা যুক্তি দিয়ে কুরআন ও ইসলামের নির্দেশ বুঝা সম্ভব নয়। কুরআনের সঠিক ও গোপন ব্যাখ্যা বুঝতে শুধু নিষ্পাপ ইমামের মতামতের উপরেই নির্ভর করতে হবে। আর সেই ইমাম লুক্কায়িত রয়েছেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হাসান নিজে কাজ করছেন। তিনি তার ভক্তদের মধ্যে একদল জানবায় ফিদায়ী তৈরি করেন। যারা তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মহনন সহ যে কোনো কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকত।

এদের মাধ্যমে তিনি উত্তর পারস্যে আলবুর্জ পর্বতের দশ হাজার কুড়ি ফুট উচ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরাজি পরিপূর্ণ উপত্যাকায় ‘আল-মাওত’ নামক এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে তথায় তার রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করেন।

সেখান থেকে তিনি তার ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে থাকেন। তার প্রচারিত ‘ধর্মীয়-রাজনৈতিক’ আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাকেই তিনি শত্রু মনে করতেন তাকে গুলি হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। ইসলামের ইতিহাসে ধর্মের নামে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঢালাও গুলিহত্যা এভাবে আর কোনো দল করে নি। এসকল দুর্ধর্ষ আত্মঘাতী ফিদায়ীদের হাতে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ উঘির নিয়ামুল মুলক, প্রসিদ্ধ আলিম নজুমুদ্দীন কুবরা সহ অনেক মুসলিম নিহত হন। পার্শ্ববর্তী এলাকা ও দেশগুলিতে গভীর ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ কেউই বুঝতে পারতেন না যে, এ সকল ফিদায়ীদের পরবর্তী টার্গেট কে। হাসানের পরে তার বংশধরেরা আল-মাওত দুর্গ থেকে ফিদায়ীদের মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তৎকালীন মুসলিম শাসকগণ এদের দমনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খৃ) হালাকু খার বাহিনী এদের নির্মূল করে।^{৩৮}

আমরা দেখছি যে, খারিজীগণের ন্যায় “বাতিনী”-গণের বিভ্রান্তির মূল ছিল ইসলামের নির্দেশনা বুঝার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের কর্মধারার গুরুত্ব না দেওয়া। তবে খারিজীদের সাথে এদের কিছু পার্থক্য আমরা দেখতে পাই:

(১) খারিজীগণ জিহাদের নামে সশস্ত্র রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ, অযোদ্ধা জনপদের উপর হামলা, হত্যা ও লুটতরাজ করলেও সাধারণত গুলি হত্যা করত না। আলী (রা), মুআবিয়া (রা) প্রমুখের গুলি হত্যার পরিকল্পনা ও আলী (রা)-কে গুলি হত্যা করা ছাড়া অন্য কাউকে তারা গুলি হত্যা করেছে বলে জানা যায় না। পক্ষান্তরে বাতিনীগণের মূল কর্মই ছিল গুলি হত্যা।

(২) খারিজীগণের কর্মকাণ্ডে আত্মহত্যা বা আত্মঘাতী হামলার কোনো ঘটনা দেখতে পাই না। পক্ষান্তরে বাতিনীগণ নেতার নির্দেশে মৃত্যুবরণ করাকেই জান্নাতের পথ বলে বিশ্বাস করত, আত্মহনন বা অন্যের হাতে মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য করত না।

(৩) খারিজীগণ ইসলামী শরীয়তের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করত। এ বিষয়ে কোনোরূপ ছাড় দেওয়াকে কুফরী বলে মনে করত। পক্ষান্তরে বাতিনীগণ শরীয়ত পালন জরুরী বলে মনে করত না। বিশেষত নেতার নির্দেশে যে কোনো শরীয়ত বিরোধী কর্ম করাকে বৈধ মনে করত।

(৪) খারিজীগণ কখনোই নিজেদের আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য

^{৩৮} আহমদ মুহাম্মাদ জলী, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ২৬৫-৩০৬; মতিউর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৯৮।

গোপনীয়তা বা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করত না। তারা নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মের কথা সুস্পষ্টভাবেই প্রচার করত। পক্ষান্তরে বাতিনী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিই ছিল গোপনীয়তা ও মিথ্যা। তারা সর্বদা নিজেদের মতবাদ গোপন রেখে সমাজের মানুষদের সাথে মত, বিশ্বাস ও কর্মে একাত্মতা প্রকাশ করত। শুধু বাছাই করা মানুষদের কাছে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে দাওয়াত দিত।^{৩০}

২. ৪. “জামাআতুল মুসলিমীন” বা তাকফীর ওয়াল হিজরা

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পরে বিভিন্ন মুসলিম দেশে অনেক ধার্মিক মুসলিম সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও রীতিনীতিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য দাবি করতে থাকেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রধান দেশ মিসরে এ জাতীয় দাবি উত্থিত হতে থাকে। সাধারণ মুসলিম যুবক ও শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে এ চেতনা ক্রমান্বয়ে স্থান লাভ করতে থাকে। পঞ্চাশের দশক থেকে মিসরের শাসকগোষ্ঠী এদের দাবির প্রতি কর্ণপাত করার পরিবর্তে এদেরকে দমন করার পথ বেছে নেন। তাঁদের দাবি পেশ করার গণতান্ত্রিক অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়। শুধু তাই নয় নির্বিচারে অগণিত আলিম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী ও সাধারণ নাগরিককে কারাগারে আটক করা হয়। এরা ছিলেন সমাজের সবচেয়ে ভদ্র, শালীন ও সৎ যুবক। তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকারের অপরাধ বা আইন অমান্যের অভিযোগ পাওয়া যায় নি। একটি মাত্র অভিযোগে তাদেরকে আটক করা হয়, তা হলো তারা ‘ইখওয়ানুল মুসলিমীন’ সংগঠনের সদস্য। আর ‘ইখওয়ানের সদস্য’ বলে কাউকে আটক করার পর উক্ত সংগঠনের সাথে তার সম্পর্ক প্রমাণ করার কোনো দায় দায়িত্ব মিসরের পুলিশ বাহিনীকে বহন করতে হতো না।

১৯৬৮ সালের দিকে আলী মাহমুদ নামে একজন সাংবাদিক ‘ইসলাম-পন্থী’ হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হন। তিনি ‘ইসলামপন্থী’ হওয়া তো দূরের কথা ধর্মকর্ম যথারীতি পালনের অভ্যাসও তার ছিল না। সর্বাবস্থায় জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে তিনি কারাগারের রোজনাংমচা প্রকাশ করেন। এর এক স্থানে তিনি লিখেছেন: মিসরীয় গোয়েন্দা বিভাগের

^{৩০} বিস্তারিত দেখুন: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের ইতিহাসে সম্মান-জঙ্গিবাদ: একটি পর্যালোচনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬।

প্রধান মেজর জেনারেল হাসান তাল‘আত গ্রেফতারকৃত ‘ইসলামপন্থীদের’ সাথে সরাসরি আলাপের মাধ্যমে তাদেরকে সংশোধনের দায়িত্ব নেন। তিনি কারাগারে আসলে ১৮/১৯ বৎসরের এক যুবক প্রশ্ন করেন, তাকে কেন বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটক রাখা হয়েছে, সে তো কোনো দলমতের সাথে কোনোভাবে জড়িত নয়? তখন লেফটেন্যান্ট সালুমা জেনারেলের কানে কিছু বলেন। তখন জেনারেল গর্জে উঠে বলেন, কেন তোমাকে মসজিদ থেকে গ্রেফতার করা হয় নি? তুমি মসজিদে ছিলে না? তাহলে কিভাবে দাবি করছ যে, তুমি কোনো দলের সদস্য নও? তখন সেখানে উপস্থিত একজন ইমাম শেখ আরিফ বলেন, বাবা, তোমাকে যদি বেশ্যালয় বা মদের আড্ডা থেকে গ্রেফতার করা হতো, তবে তোমার বাঁচার পথ থাকত। কিন্তু তোমাকে যেহেতু মসজিদে পাওয়া গিয়েছে, কাজেই তোমার দুর্ভাগ্যের শেষ নেই!^{৪০}

এভাবে নির্বিচারে নিরীহ, ধার্মিক যুবকদেরকে গণহারে গ্রেফতার করা হয়। কারাগারের অভ্যন্তরে তারা অকল্পনীয় ও অবর্ণনীয় অমানবিক অত্যাচার ও বিচারবহির্ভূত হত্যার সম্মুখীন হন। এ অত্যাচার কতিপয় যুবকের মধ্যে উগ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এরা খারিজীদের অনুরূপ সন্ত্রাসী চিন্তাচেতনাকে ইসলামী আদর্শ বলে প্রচার করতে থাকে। এদের অন্যতম ছিল মিসরের গুরুত্বপূর্ণ আহমদ মুসতফা প্রতিষ্ঠিত ‘জামা‘আতুল মুসলিমীন’।

গুরুত্বপূর্ণ আহমদ মুসতফা ১৯৪২ সালে আসইযুতে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে ১৯৬৫ সালে মিসরের আসইযুত শহরের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তাকে ‘ইখওয়ানুল মুসলিমীনের’ সদস্য হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৭ বৎসর কারাভোগের পর ১৯৭১ সালে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগার থেকে তিনি নতুন এক ‘বৈপ্লবিক’ চিন্তা ও তত্ত্ব নিয়ে বের হন।

তিনি ও তাঁর অনুসারীরা দাবি করেন যে, একমাত্র তাঁদের জিহাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই দীনের বিজয় সম্ভব হবে। তারা আরো দাবি করেন যে, অত্যন্ত দ্রুতই তারা এ বিজয় অর্জনে সক্ষম হবেন। তাঁদের এসকল দাবি দাওয়া ও দ্রুত ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগ্রহ অনেক যুবককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। তারা ‘জামা‘আতুল মুসলিমীন’ নামে একটি দল গঠন করেন। সাধারণ মানুষ এ দলকে “জামাআতুল তাকফীর ওয়াল হিজরাহ” নামে চিনতেন। তাকফীর অর্থ কাফির বলা এবং “হিজরাহ” অর্থ হিজরত বা পরিত্যাগ করা। এ দলের মূলনীতি ছিল তারা ছাড়া সমাজের সকল মানুষই কাফির এবং

^{৪০} মুহাম্মাদ সুরুর বিন নাইফ, আল-হুকমু বিগাইরি মা আনযাল্লাহু ও আহলুল ওলু, পৃ. ৩০২।

কাফিরদের সমাজ থেকে হিজরত করে তাদের সমাজে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি মুসলিম বলে গণ্য হবে না।

শুকরী ও তাঁর অনুসারীরা খারিজী মতবাদ গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দেন এবং খারিজী মতবাদই কুরআন-হাদীস সমর্থিত একমাত্র সঠিক মতবাদ বলে দাবি করেন। খারিজীদের মতই তাদের মধ্যে ইলমের চেয়ে আবেগ ছিল বেশি। এদের নেতৃবৃন্দের কেউই আলিম ছিলেন না; সকলেই ছিলেন সাধারণ শিক্ষিত যুবক। কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই তারা চূড়ান্ত বলে মনে করতেন। এছাড়া সাহাবীগণের যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল মুসলিম প্রজন্মকে তারা ইসলামচ্যুত বলে মনে করতেন; কারণ, -তাদের দাবি অনুসারে- তাঁরা সঠিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করে খোদাদ্রোহী তাগুতী রাষ্ট্রশক্তির সাথে আপোস করেছেন।

সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগের আলিম, ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও সমকালিন সকল আলিমকে তারা মুর্থ, স্বার্থপর, আপসকামী, 'তাগুত'-এর অনুসারী, ইত্যাদি বলে অভিহিত করতেন। কোনো আলিমের পুস্তক পড়তে বা কাউকে প্রশ্ন করতে তারা তাদের অনুসারীদের কঠিনভাবে নিষেধ করতেন।^{৪১} সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের আলিমদের ব্যাখ্যা বা মতামতকে তারা কোনোরূপ মূল্যায়ন করতেন না। হাদীস গ্রহণ করার বিষয়ে তারা নিজেদের পছন্দের উপর নির্ভর করত। তাদের মতে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি মানুষ ও মানুষের বুদ্ধি-বিবেকই ইসলামের মূল উৎস।^{৪২}

এরা খারিজীদের মতই বিভিন্ন যুক্তি ও অযুহাতে তাদের দলভুক্ত হতে আপত্তিকারী সকল মুসলিমকে কাফির-মুরতাদ হিসেবে গণ্য করে তাদেরকে গুলি হত্যা করার জন্য দলের কর্মীদের প্রতি নির্দেশ জারি করে। বিশেষত যে সকল আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব এদের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বিভ্রান্তি বুঝাতে চেষ্টা করতেন বা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাদের মতবাদের ভুলগুলি প্রকাশ করতেন তাদেরকে তারা গুলি হত্যা করতে শুরু করে। ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে তারা মিসরের সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও গবেষক পণ্ডিত ড. মুহাম্মাদ হুসাইন যাহাবীকে অপহরণ করে এবং পরে তাকে হত্যা করে।^{৪৩} এ হত্যাকাণ্ডের পরে সরকার এদেরকে শ্রেয়তার করে

^{৪১} মুহাম্মাদ সুরুর, আল-হুকম, পৃ. ৫৬।

^{৪২} মুহাম্মাদ সুরুর, আল-হুকম, পৃ. ১২৩।

^{৪৩} মুহাম্মাদ সুরুর, আল-হুকম, পৃ. ৯-১১; ২৮৭-৩৫০।

এবং ৩০/৩/১৯৭৮ তারিখে শুক্রী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। বাকিদেরকে দীর্ঘ মেয়াদি কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

দেখা যায় যে, ড. যাহাবীর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে একমাত্র মিসর সরকারই লাভবান হন। তাঁরা এ অভিযোগে শুক্রী ও তার সহকর্মীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। এ ঘটনাকে ভিত্তি করে সরকার এবং প্রচার মাধ্যম ঢালাওভাবে ইসলামপন্থী ও ধার্মিক মানুষদেরকে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করতে শুরু করে এবং সরকার নতুন করে ‘ইসলামপন্থীদের’ গ্রেফতার ও অত্যাচারের সুযোগ পান। সর্বোপরি ড. যাহাবীর মত একজন দলনিরপেক্ষ অথচ স্পষ্টভাষী আলিমের সমালোচনা থেকে সরকার রক্ষা পান।

এ অপহরণ, হত্যাকাণ্ড, বিচার ও শাস্তিপ্রদানের “টাইমিংটাও” অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ড. যাহাবীর অপহরণের পরে মিসরের সাথে ইস্রায়েলের শান্তি আলোচনা শুরু হয় ও শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। মিসরবাসীগণ এবং বিশেষত “ইসলামপন্থীরা” ইস্রায়েলের সাথে চুক্তির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ড. যাহাবীর অপহরণের পর ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার, ধরপাকড় ও নির্যাতনের মধ্যেই এ চুক্তির আলোচনা শুরু ও শেষ হয়। এদের মৃত্যুদণ্ড “ইসলামপন্থী”-দেরকে “মেসেজ” প্রদান করে যে, কেউ শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিলে তারও এরূপ অবস্থা হবে।

যদিও শুক্রী ও তার সহচরগণ তাদের মতবাদের ভিত্তিতে ‘কাফির-মুর্তাদ’ ড. যাহাবীকে হত্যা করার কথা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করে, তবুও অনেক গবেষক মনে করেন যে, সরকারের অনুচরগণই তাদের গোপনীয়তা, ব্যগ্রতা ও উগ্রতার কারণে তাদেরকে সুকৌশলে এ কর্মে প্ররোচিত করে। বিশেষত, ড. যাহাবীকে অপহরণের মূল দায়িত্ব পালন করেন আহমদ তারিক নামে একজন পুলিশ অফিসার, যিনি অপহরণ ঘটনার কিছু আগে ‘ইসলাম প্রতিষ্ঠার’ বিশেষ আগ্রহ নিয়ে জামা‘আতুল মুসলিমীনে যোগদান করেন।^{৪৪}

১৯৭৮ সালের পরে এদের জোরালো উপস্থিতি না থাকলেও এদের চিন্তাচেতনা ও মতবাদগুলি পরবর্তীকালে অনেক আবেগী মুসলিমের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। উগ্রতায় লিপ্ত সমকালীন বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে তাদের এ সকল মতবাদ একইভাবে বিদ্যমান বলে দেখা যায়।

^{৪৪} মুহাম্মাদ সুরুর, আল-হুকম, পৃ. ৩২০-৩৪৩।

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রাচীন খারিজীগণের ন্যায় শুকরী মুস্তফা ও তাঁর “জামাআতুল মুসলিমীন” বা “জামাআতুল তাকফীর ওয়াল হিজরা”-র মূল বিভ্রান্তি ছিল অতি আবেগ, দীনের বিষয়ে অতি-বাড়াবাড়ি, ধর্ম পালন ও বুঝার অহঙ্কার ও কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা বুঝার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের প্রায়োগিক সুন্নাত বা কর্মরীতির গুরুত্ব না দেওয়া। এ থেকে তারা বহুমুখি বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হন। সেগুলির মধ্যে রয়েছে:

(১) পাপের কারণে মুমিনকে কাফির বলা। ব্যাহিক পাপ না থাকলেও তাদের মতের বিরোধী সকলকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে কাফির বলা।

(২) কুরআন বিরোধী আইনের বিদ্যমানতার কারণে উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলির শাসকদেরকে কাফির বলা। এ সকল রাষ্ট্রকে কাফির ও তাগুতী রাষ্ট্র বলে গণ্য করা। এ সকল রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রীয় আনুগতের কারণে কাফির বলা। যারা এদের কাফির না বলে তাদেরকেও কাফির বলা। একজন মুসলিমকে প্রশ্নভোরের মাধ্যমে মুসলিম বলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে মুসলিম বলে স্বীকার না করা।

(৩) এ সকল রাষ্ট্র ও সমাজকে জাহিলী ও কাফির সমাজ মনে করে এগুলি থেকে “হিজরত” করা, বা অন্তত “মানসিক হিজরত” করা, অর্থাৎ, মানসিকভাবে নিজেকে এদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন বলে মনে করা, সমাজের মসজিদগুলিতে জুমআ ও জামাআত আদায় না করা।

(৪) নিজেদের দলকে “আল-জামাআত” বলে দাবি করা এবং তাদের আমিরের হাতে “বাইয়াত” করাকে ইসলামে প্রবেশের শর্ত বলে দাবি করা।

(৫) সমাজের সকল আলিমের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা ও তাদের ঘৃণা করা। সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম, ইমাম, ফকীহ ও নেককারগণকে ঘৃণা করা ও তারা কেউই ইসলাম সঠিকভাবে বুঝেন নি বা পালন করেন নি বলে দাবি করা। আলিম, ইমাম ও সালফে সালেহীনের অনুসরণ বা তাকলীদকে শিরক বলে দাবি করা। সকলের জন্য ইজতিহাদ জরুরী বলে দাবি করা।

(৬) ইসলামের ফরয ইবাদতগুলির মধ্যে বড়-ছোট নির্ণয় করা। “দীন প্রতিষ্ঠা” অর্থ “রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা” বলে দাবি করা, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বড় ফরয বলে দাবি করা এবং বড় ফরযের জন্য ছোট ফরয-ওয়াজিব পরিত্যাগ করাকে

জায়েয বলে দাবি করা। যেমন দীনের প্রয়োজনে (!) ফরয সালাত ত্যাগ, সিয়াম ত্যাগ, দাড়ি মুগুন, মদপান, কাফির নারী বিবাহ করা ইত্যাদি।

(৭) ইসলামের বিধিবিধানকে পর্যায়ক্রমিক পালনীয় বলে দাবি করা। তারা দাবি করতেন যে, মিসরের তৎকালীন সময়ে তারা “মক্কী” যুগে অবস্থান করছেন। কাজেই ইসলামের অনেক বিধানই তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

(৮) শিক্ষাগ্রহণের বিরোধিতা করা, বিশেষত ‘তাগুতী’ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ বা সনদগ্রহণকে পাপ বা কুফরী বলে গণ্য করা এবং নিরক্ষর থাকাকে ইসলাম নির্দেশিত বলে দাবি করা।

(৯) “কাফিরদের” বা তাদের মতের বিরোধীদের হত্যা করা বৈধ, জিহাদ ও দীন প্রতিষ্ঠার কর্ম বলে দাবি করা।^{৪৫}

২. ৫. দলীল-প্রমাণে পছন্দনির্ভরতা

আমরা উল্লেখ করেছি যে, বাতিনী শিয়াগণ মূলত কুরআন, হাদীস ও আলিমগণের মতামত কোনোকিছুই মানত না। তাদের একমাত্র দলীল ছিল কথিত ইমাম বা তাদের খলীফাগণের ব্যাখ্যা ও মতামত। খারিজীগণ ও জামাআতুল মুসলিমীন কুরআন ও হাদীসের উপর নির্ভরতার ঘোষণা দেয়। তারা তাদের সকল মতামতের প্রমাণ কুরআন ও হাদীস থেকে পেশ করার চেষ্টা করে। তবে তাদের প্রমাণ পেশের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো পছন্দনির্ভরতা। তারা যে আয়াত বা হাদীসকে নিজেদের পক্ষে বলে মনে করত সেগুলিকে গ্রহণ করত। আর যেগুলি তাদের মতের বিপক্ষে সেগুলিকে মানসূখ বা রহিত বলে অথবা ব্যাখ্যা করে বাতিল করত। কখনো কুরআন বুঝার জন্য “শানে নুযূল” বা অবতরণের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে অস্বীকার করত। আবার কখনো অবতরণের প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে কোনো আয়াতের সাধারণ নির্দেশনা মানতে অস্বীকার করত। কখনো আধুনিক কোনো গবেষক বা প্রসিদ্ধ আলিমের কোনো কোনো বক্তব্যকে তারা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে তাদের উগ্রতা প্রমাণের চেষ্টা করত। আবার কখনো কোনো আলিমের কথাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করাকে তারা শিরক বলে দাবি করত।

^{৪৫} বিস্তারিত জানতে নিম্নের পুস্তকগুলি পাঠ করুন, ড. হাসান হুদাইবী, দুআতুন লা কুদাত; সালিম বাহনসাবী, আল-হুকুম ওয়া কাদিয়াতু তাকফীরিল মুসলিম ও মুহাম্মাদ সুরুর ইবন নাইফ, আল-হুকুম বিগাইরি মা আনযাল্লাহু ওয়া আহলুল ওলু। আরো দেখুন: ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ, পৃ. ১৩২-১৪১; ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলী, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ১০৮-১৪৯।

‘নাসখ’ একটি সুপরিচিত ইসলামী পরিভাষা। এর অর্থ রহিত হওয়া। মহান আল্লাহ কুরআন নাযিল করার মাধ্যমে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অনেক বিধান রহিত করেছেন। এ ছাড়া কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বিধিবিধান আংশিক বা পুরোপুরি রহিত করে অন্য বিধান প্রদান করেছেন। তবে সাধারণভাবে আলিমগণ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অর্থের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য ‘নাসখ’ পরিভাষা ব্যবহার করেন। অর্থাৎ এ আয়াতের নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে অন্য অমুক আয়াতের সাথে সমন্বয় করে। এ দ্বার তারা বুঝান না যে, কুরআনে পঠিত কোনো আয়াতের বিধান বা আদেশ পুরোপুরি বাতিল বা অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। কারণ কুরআনের প্রতিটি আয়াত মুতাওয়াতির বা অগণিত মানুষের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর নিকট সংরক্ষিত। এর কোনো বিধান, বাক্য, অক্ষর বা অর্থকে রহিত দাবি করতে হলে ঠিক অনুরূপ মুতাওয়াতির কোনো নির্দেশনা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত হতে হবে। এ ছাড়া কুরআনের কোনো নির্দেশ রহিত বলে গণ্য করা যায় না।

যেমন কুরআনে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, ধর্মের বিষয়ে জবরদস্তি নেই। আবার আল্লাহ যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, যুদ্ধের নির্দেশ দ্বারা জবরদস্তির নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়েছে। কথাটির অর্থ হলো ধর্মের মধ্যে জবরদস্তি নেই বলতে ধর্মীয় স্বাধীনতা বা অধিকার রক্ষার জন্যও যুদ্ধ করা যাবে না এরূপ মর্ম রহিত হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, আয়াতটির নির্দেশনা রহিত হয়েছে। ইসলাম কখনোই বলপূর্বক ধর্মান্তর বা ধর্মের কারণে কারো নাগরিক অধিকার হরণের অনুমতি দেয় নি। জিহাদ, কিতাল বা যুদ্ধ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার জন্য নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে বা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তো নয়ই, পরবর্তী যুগেও ইসলাম গ্রহণের জন্য বল প্রয়োগের ঘটনা ঘটে নি।

জামাআতুল মুসলিমীন বা সমকালীন খারিজীগণ কুরআনকে তাদের সকল মতের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করলেও তাদের মতের ব্যতিক্রম আয়াত বা নির্দেশনাকে ‘রহিত’ বা মানসূখ বলে দাবি করত। তাদের এরূপ দাবির পক্ষে তারা কুরআন বা হাদীসের কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারত না। তবে কোনো কোনো আলিমের মতকে তারা প্রমাণ হিসেবে পেশ করত।

জামাআতুল মুসলিমীন পূর্ববর্তী ইমাম ও আলিমগণের বিষয়ে অত্যন্ত খারাপ মন্তব্য করত এবং দীনের বিষয়ে কোনো আলিমের কথাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করাকে অবৈধ বলে দাবি করত। কিন্তু নাসখ বিষয়ক মতামতের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজন মত তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন আলিমের মতামত পেশ করত। সর্বোপরি তারা অন্য কোনো আলিমের মতামত গ্রহণকে অপছন্দনীয় মনে করলেও তাদের নিজেদের মত গ্রহণকে অন্যদের জন্য বাধ্যতামূলক বলে মনে করত। দীনের বিষয়ে তাদের বুঝ বা মতামতকেই একমাত্র সত্য দীন বলে বিশ্বাস করত।

তাদের পছন্দ নির্ভরতার একটি বিশেষ দিক ছিল, সমকালীন বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বের বক্তব্য ও লিখনিকে পছন্দমত দলীল হিসেবে পেশ করা। এ সকল গবেষক ও আলিম সমকালীন সমাজগুলির অবক্ষয় বুঝাতে অনেক সময় এগুলিকে “জাহিলী” বা “তাগুতী” বলেছেন। এদ্বারা তারা এগুলিকে কাফির বলে বুঝান নি। কিন্তু এরা তা বুঝেছে। কেউ কেউ সমাজ পরিবর্তনের কর্মকে “জিহাদ” বলেছেন বা সবচেয়ে বড় দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। এদ্বারা তারা বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন মাত্র; এ জাতীয় কর্মকে শরীয়তের পারিভাষিক জিহাদ বা শরীয়তের মাপকাঠিতে সবচেয়ে বড় ফরয বলে বুঝান নি। কিন্তু তারা তা বুঝেছে। কোনো কোনো গবেষক ও আলিম আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মান্য করার সাথে আল্লাহর আইন মান্য করার বিষয়টি সংযুক্ত করেছেন। এদ্বারা তারা বুঝান নি যে, ইলাহ মানেই হুকুম দাতা বা হুকুম না মানলেই কুফরী হয়। কিন্তু এরা তাদের মতপ্রতিষ্ঠায় এদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে। আবার তারা এ সকল আলিমের অন্য অনেক মত প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাদের ভুল ব্যাখ্যার সংশোধনে অন্যান্য আলিমের মতামতও প্রত্যাখ্যান করেছে।

এখানে পছন্দ-নির্ভরতা ছাড়াও তাদের বিভ্রান্তির কারণ ছিল, কোনো আলিম বা গবেষকের বক্তব্যকে আক্ষরিকভাবে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা। মুমিন মূলত কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য আক্ষরিকভাবে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করবেন। সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবার আলোকে তা বুঝতে চেষ্টা করবেন। পরবর্তী ইমাম, ফকীহ ও আলিমদের বক্তব্য ও মতামতের সহযোগিতা নিবেন।

২. ৬. সুন্নাতই মুমিনের রক্ষাকবজ

খারিজী, বাতিনী, জামাআতুল মুসলিমীন ও অন্যান্য সকল বিভ্রান্ত দল ও গোষ্ঠীর বিভ্রান্তির মূল কারণ দীন পালনে “সুন্নাতের” প্রতি অবহেলা। সুন্নাতের অর্থ, পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রয়োগ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি “এহইয়াউস সুন্নান” গ্রন্থে। এখানে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, সুন্নাত অর্থ কর্মে ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের ব্যাখ্যায়, পালনে ও পদ্ধতি গ্রহণে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের পদ্ধতিও সুন্নাত। কখনোই কোনোভাবে মুমিন নিজেকে সাহাবীগণ ও প্রথম প্রজন্মগুলির মানুষদের চেয়ে অধিক ঈমানদার, অধিক আমলকারী, ইসলাম সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ বা ইসলাম বুঝার ক্ষেত্রে অধিক অগ্রসর বলে কল্পনা করতে পারেন না।

যে কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে যতটুকু বলেছেন ততটুকুই বলা, যে কর্ম তিনি যেভাবে যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে যে পরিমাণ করেছেন ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে সে পরিমাণ করা, যে কথা তিনি বলেন নি এবং যে কর্ম তিনি করেন নি তা না বলা ও না করাই সুন্নাত। কথায়, কর্মে, পালনে ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-হুবহু অনুকরণই সুন্নাত। তিনি যা বলেন নি তা বলা এবং তিনি যা করেন নি তা করা সুন্নাতের ব্যতিক্রম বা খিলাফে সুন্নাত। যে ইবাদত তিনি উন্মুক্তভাবে পালন করেছেন, অর্থাৎ কোনো নিয়ম, সময় বা রীতি নির্দিষ্ট করে দেন নি, সে ইবাদত উন্মুক্তভাবে পালন করাই সুন্নাত। কোনো নিয়ম, রীতি বা পদ্ধতিকে উক্ত ইবাদতের অংশ বলে গণ্য করা খিলাফে সুন্নাত।

তিনি যা বলেন নি বা করেন নি এবং বলতে বা করতে নিষেধও করেন নি তা সুন্নাতের ব্যতিক্রম হলেও জায়েয হতে পারে। আর তিনি যা বলেন নি বা করেন নি এবং বলতে বা করতে নিষেধ করেছেন তা না-জায়েয বা অবৈধ। সুন্নাতের ব্যতিক্রম জায়েয বিষয় মুমিন প্রয়োজনে করতে পারেন, তবে তাকে দীনের অংশ বলে কল্পনা করতে পারেন না। সুন্নাতের ব্যতিক্রম বা সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো কথা, কর্ম বা পদ্ধতিকে ঈমান, আকীদা, দীন বা ইবাদতের অংশ বলে গণ্য করা থেকেই সকল বিপর্যয় ও বিভ্রান্তির গুরু।

কুরআন-হাদীস থেকে কোনো ইবাদতের নির্দেশনা গ্রহণ করলেই হবে না, উপরন্তু সে ইবাদত রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে পালন করেছেন তা জানতে

হবে এবং অবিকল তাঁরই অনুকরণে পালন করতে হবে। প্রয়োজনে উপকরণ বা জাগতিক বিষয়ে সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো বিষয় বলা বা করা যেতে পারে, তবে তাকে উক্ত ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবে না এবং যথাসম্ভব সীমিত পর্যায়ে তা ব্যবহার করতে হবে। এ সকল বিষয় অগণিত উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি “এহইয়াউস সুন্নাহ” গ্রন্থে।

জঙ্গিবাদ, চরমপন্থা বা উগ্রতা মূলত ইসলামের একটি ইবাদতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, তা হলো: “অন্যের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা”। ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ, দাওয়াত, জিহাদ, বিচার, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নামে এ ইবাদত পালিত হয়। বিভ্রান্তিতে নিপতিত মানুষেরা এ সকল ইবাদত পালনের নির্দেশ এবং এগুলির ফযীলত বিষয়ক আয়াত ও হাদীস গ্রহণ করেছেন, নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন এবং পালনের পদ্ধতি তৈরি করেছেন। এ সকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের হুবহু অনুকরণের চেষ্টা করেন নি।

সালাত, সিয়াম, যিকর, জানাযা ইত্যাদির ন্যায় দাওয়াত, জিহাদ, দীন প্রতিষ্ঠা, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদিও ইবাদত। সকল ইবাদতই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে পালন করেছেন। সাহাবীগণ তাঁর থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ও পালন করেছেন। পরবর্তী দু প্রজন্ম- যাদের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাক্ষ্য দিয়েছেন- তাঁরাও এ সকল ইবাদত পালন করেছেন।

আমরা যদি এ সকল ইবাদত সঠিকভাবে পালন করতে চাই, তাহলে আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে যে, আমরা যে ইবাদতের যে নামকরণ করছি, যে গুরুত্ব প্রদান করছি তা তারা করেছেন কিনা? আমরা যে পদ্ধতিকে ইবাদতের অংশ মনে করছি তা তারা করেছেন কিনা? আমরা যে পরিস্থিতিতে যে কথা বলছি বা যে কর্ম করছি সেরূপ পরিস্থিতি বা তার কাছাকাছি পরিস্থিতি তাদের কারো যুগে বিদ্যমান ছিল কিনা? এরূপ পরিস্থিতিতে তারা কি করেছেন? কিভাবে করেছেন?

বিভ্রান্তিতে নিপতিত মানুষেরা এ সকল বিষয় গভীরভাবে জানার কোনো চেষ্টা করেন নি। ফলে তারা বিশ্বাসগত, গুরুত্বগত বা পদ্ধতিগত বিভ্রান্তি ও বিদআতের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে সুন্নাতের আলোকে তাদের বিভ্রান্তিগুলি অনুধাবনের চেষ্টা করব।